Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
UGC Approved, Journal No: 48666
Volume-VII, Issue-III, January 2019, Page No. 87-99
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পে চাকুরিরতা নারী ও মধ্যবিত্ত মানস

ড. সুনিমা ঘোষ
অধ্যাপিকা, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ
অভিজিৎ চৌধুরী
গবেষক, গৌড়বঙ্গ বিশ্ব বিদ্যালয়, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ

Abstract

Narendra Nath Mitra, one of the reuowned and celebrated fagures in the arena of Bengali Literature, is hailed as the perfect painter of the the-then Bengali middle class lifestyle. During the most tumultous and riotous days of the '40s, his writing truly reflected the ups and downs and fiasco of the middle class Bengali life. People belonging to this middle class struggled a lot to come out of the debacles, broken idealism and dreams that shattered them and made a vacuum in the troublesome struggling society. And all these ills are mirrored masterfully in the hands of Narendra Nath Mitra. In this hard time the women were forced to cross their thresholds to offer labour beside their male counterparts because of the economic disasters prevailed at that time. From that onwards the emergence of women as economically independent ones, was considered the phase of women empowerment. It did not happen overnight, they all had to go through so many patriarchal ordeals. Hence the main objective of this essay is to bring forth the struggle of those working independent women who were represented gloriously by Narendra Nath Mitra.

Keywords: Narendranath Mitra, Middle Class, Working Women, Family and Society.

বাংলা কথা-সাহিত্যের পাতায় বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবনের চিত্র নির্মাণে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপদক্ষ শিল্পী হলেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র। উত্তাল চল্লিশের দশকের ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সময়ে ও তার পরবর্তীতে বাঙালি মধ্যবিত্তের ভাঙ্গা গড়ার বিবর্তন গত ইতিহাসটি তাঁর লেখনিতে বিশেষভাবে ধরা পড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, অন্নসংকট, বস্ত্রসংকট, দাঙ্গা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু জীবন ইত্যাদি সমস্যায় জর্জরিত, ছন্নছাড়া মধ্যবিত্তের আদর্শবাদ, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা, সাফল্য-ব্যর্থতাময় জীবনযুদ্ধে টিকে থাকার লড়াইয়ের নানান কাহিনি ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর সুবিস্তৃত 'গল্পমালা'য়। বেঁচে থাকার পাশাপাশি বহু মধ্যবিত্ত নারীকেও সেদিন অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে পার হতে হয়েছিল বাড়ির চৌকাঠ। মধ্যবিত্তের সনাতন ভদ্রয়ানার সংস্কার ঘুচিয়ে পথে নেমে খুঁজতে হয়েছিল টাকার উৎস। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় মধ্যবিত্ত নারীদের সেই সাবলম্বী হওয়ার যাত্রাপথটি কখনই মসৃন ছিল না। প্রতি পদক্ষেপে তাকে লড়তে হয়েছে আপন পরিবার ও বাইরের সমাজের নানা নিয়ম ও সংস্কারের বিরুদ্ধে মধ্যবিত্তের রূপকার নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কিছু গল্পালম্বনে সেই চাকুরিরতা মধ্যবিত্ত নারীদের জীবনের স্বরূপ উন্মোচন করাই আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধের লক্ষ্য।

আমরা আমাদের আলোচনার শুরুতেই নরেন্দ্রনাথ মিত্রের লেখা **'সেতার'** গল্পটির কথা স্মরণ করতে পারি। এই গল্পে কলকাতার নাগরিক জীবনে এক নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রবল অর্থনৈতিক সংকটের মাঝে সনাতন মধ্যবিত্তীয় সংস্কারগুলি উপেক্ষার মধ্যে দিয়ে এক চাকুরিরতা নারীর দাম্পত্য সংকটের দায় ও শিল্প ধর্মের দ্বন্দ্বকে দেখানো হয়েছে। পরিবারটির দৈনন্দিন জীবনের চাহিদাগুলি মেটানোর জন্য এতদিন 'সুবিমলের চাকরিই ভরসা।'[১] সেই সুবিমল হঠাৎ করে থাইসিস রোগে আক্রান্ত হওয়ায় পরিবারটি প্রবল আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়। বুড়ো বাপ একটা দেশি মার্চেন্ট অফিসে হিসেব লেখেন। অসুখ-বিসুখ তো দূরের কথা, বাড়ির দৈনন্দিন অনেক খরচই তার হিসেবের মধ্যে কুলায় না। তাই সুবিমল অসুস্থ হওয়ায় প্রথম ধাক্কাতেই হাত দিতে হয়েছে স্ত্রী আর পুত্রবধূর গয়নায়। সেইসঙ্গে হাত পাততে হয়েছে স্বজন-বন্ধুদের কাছে কিন্তু তাদের সংখ্যাও তো অগণ্য নয়। এই আর্থিক সংকটে বাড়ির বাসন-কোসন, সামান্য আসবাবপত্র প্রায় সবই অদৃশ্য হয়েছে, তবু রোগ থেকে রেহাই হয়নি। অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে কিছু দিন হল সুবিমলের জন্য হাসপাতালে ফ্রী বেডের ব্যবস্থা হলেও এখনও চিকিৎসা জনিত অন্যান্য খরচ প্রতি মাসেই পঁচিশ-ত্রিশ টাকা দরকার। সুবিমল জানে এই ক'টি টাকা পাঠাতেও বাপের সাধ্য কুলায় না। তাই সুবিমল বাধ্য হয়েছে বন্ধুদের কাছে হাত পাততে। কিন্তু সেই হাত পাতারও একটা সীমা আছে। তাই শেষে সুবিমল বন্ধুদের কাছ থেকে টাকা না চেয়ে খুঁজেছে বন্ধুদের ঠিকানা কে, কোথায়, কোন্ ভাল চাকরি করে সেই অন্বেষণ-ই ছিল উদ্দেশ্য। তবে সেই বন্ধুদের উত্তরে আড্ডাবাজ, বন্ধুপ্রিয় বাঙালি মধ্যবিত্তের বন্ধু সম্পর্কের উপরে-র চামড়াটা খসে গিয়ে আসল স্বরূপটা স্পষ্টভাবে ধরা দেয়—

> *"অনেকেই চিনতে পারে না, অনেকের কাছ থেকে জবাব পাওয়া যায় না। সকলে সমান নয়, কেউ কেউ আবার দেয়ও। ভরসা দেয় থাইসিস রোগটা আজকাল আর এমন কিছু মারাত্মক নয়, বিশেষত গোড়াতেই যখন ধরা পড়েছে। কেউ কেউ দু-এক মাস পাঁচ-দশ টাকা পাঠায়, কিন্তু তারপর হয় আর তাদের সাড়া মেলে না, না হয় অত্যন্ত হাত-টানাটানির খবর আসে।"[২]*

নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারটির এই আর্থিক সংকট হতে উত্তোরণের পথ খুঁজতেই বাড়ির কুলবধূ, সুবিমলের স্ত্রী নীলিমা সঙ্গীত আর সেতারকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে। নিলীমার সঙ্গীত শিক্ষা কোনও প্রথাগত সঙ্গীত সাধনার ফল নয়। তা নিতান্তই তার নিজের উৎসাহে রেকর্ড রেডিও শোনা বিদ্যা। শ্বশুর বাড়িতে এসেও শ্বশুর শাশুড়ির অপছন্দের কারণেই সেই ইচ্ছাটা চাপা পড়ে গিয়েছিল। বর্তমানে সংকটে তাই খানিকটা দায়ে পড়েই গানের কথা ভেবেছে নিলীমা। গান আজ যেন তার কাছে, 'সখ নয়, আনন্দ নয়, প্রয়োজন আর পেশা।'[৩] নীলিমা তাই ত্রিশ টাকা চাকরি গানের টিউশনি নেয় কালিঘাটের দূর সম্পর্কের কুটম্ব রায় সাহেব পি.এন. বিশ্বাসের বাড়িতে। নীলিমার ছাত্রী হল রায় সাহেবের দুই নাতি অঞ্জু আর মঞ্জু। সুবিমল আর শ্বশুর শাশুড়ির মনে একটু দ্বিধা থাকলেও শেষ পর্যন্ত কেউ আপত্তি করেনি। সুবিমলও নিজেদের অবস্থাকে উপলব্ধি করে স্পষ্টতই নীলিমাকে জানিয়েছে, 'অন্যের কাছ থেকে ভিক্ষে নেওয়ার চেয়ে তোমার রোজগার আমি সহজভাবেই নিতে পারব।'[৪]

পরিবারের সংকট হতেই নতুন এক সম্ভাবনার সূত্রপাত ঘটে নীলিমার জীবনে। গান শোনাতে গিয়ে রায় সাহেবের ছেলে পুরন্দরের সঙ্গে নীলিমার আলাপ এবং মুখ্যত তারই উদ্যোগে ওস্তাদ নারায়ণ ত্রিবেদীর কাছে সেতারের তালিম নেওয়া শুরু করে নীলিমা। কিন্তু এই সেতার শেখার শুরুটা যতটা ভালবাসা বা ভাললাগার আনন্দ থেকে তার চেয়ে অনেক বেশি প্রয়োজন থেকে, যতটা না শিল্পের জন্য, তার চেয়েও বেশি টাকার জন্য—

> *"নীলিমা বিদ্যাভাস আরম্ভ করল। টিউশনিতে আসবার আগে আসে এখানে। কিছুক্ষণ বসে বসে বাজায়, ত্রিবেদী চেয়ে চেয়ে দেখেন। মাঝে মাঝে কেবল হেসে মাথা নাড়েন, হল না। অদ্ভূত ধৈর্য। কোন বিরক্তি নেই। তিরস্কার ভর্ৎসনার আভাস নেই। এমন সহিষ্ণুতা সাধারণত দেখা যায় না।*

কিন্তু ধৈর্য নেই নীলিমার নিজের। প্রায়ই প্রশ্ন করে আর কত দিন বাকি। কত দিনে অন্ততকাজ চালাবার মত বিদ্যেটা আয়ত্তে আসবে। টাকা রোজগার করতে পারবে ছাত্র-ছাত্রীকে শিখিয়ে। ত্রিবেদী হাসেন, বলেন, 'যা আনন্দের জিনিস তাকে তুমি এত তাড়াতাড়ি প্রয়োজনে লাগাতে চাচ্ছ। আনন্দকে ছাপিয়ে প্রয়োজন তো একদিন বড় হয়ে উঠবেই, কিন্তু তা আজই কেন?'

নীলিমা চুপ করে থাকে। তিরস্কারের জন্য দুঃখ করে না। ত্রিবেদী কি করে বুঝবেন তার প্রয়োজনের কথা, যার সঙ্গে আনন্দের ভেদ নেই কিংবা যা আনন্দের চেয়েও অনেক বড়।"[৫]

এই প্রয়োজনের তাগিদে, টাকার তাগিদে নীলিমার এই ঘর থেকে বেড়িয়ে গান ও সেতার আঁকড়ে ধরার মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালীন দুর্মূল্যের বাজারে পরিস্থিতির চাপে ঘর ছাড়া বহু গৃহলক্ষ্মীর জীবন সংগ্রামের কাহিনি প্রতীকায়িত হয়ে ওঠে। নীলিমার মতন এমন বহু মেয়েরাই সেদিন সংসার বাঁচানোর জন্য ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে বিবিধ বৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। নীলিমার এই জীবন সংগ্রাম চল্লিশের দশকের এক জীবন্ত দলিল। দৃঢ়চেতা নীলিমা তাঁর সময়ের প্রতিনিধি হিসেবে নিজের অভীষ্ট লক্ষ্যে সফল হয়ে নিজের প্রথম মাসিক ইনকামের টাকা স্বামী সুবিমলের হাতে তুলে দিতে পেরেছে। তাতে যে আনন্দের ঝঙ্কার উঠেছে তা সেতার বাজানোর চেয়ে বেশি বই কম নয়—

'তিনখানা দশ টাকার নোট ব্লাউজের ভেতর থেকে বের করে স্বামীর হাতে নীলিমা গুঁজে দিল। আঙুলে আঙুলে মেশামেশি করে রইল খানিক্ষণ। ঝঙ্কারটা সেতারের চেয়ে কম হল না।[৬]

কিন্তু স্বামীর চিকিৎসার টাকা টুকু অর্জন করাই আর লক্ষ্য নয়, সেইসঙ্গে স্বামীকে সুস্থ করে তাকে চেঞ্জে পাঠানোর টাকাটাও নিজেই টিউশন করে জোগার করবে বলে মনে মনে স্থির করে ফেলে নীলিমা। সুবিমলকে সত্যি সত্যি নীলিমা দেখিয়ে দেবে তার সাধ্যের সীমা কতখানি। খুঁজে খুঁজে নীলিমা সেতারের টিউশনি নিল। চেষ্টা করল রেডিয়োতে। সবাই যে নীলিমার আবেদনে সহজেই সাড়া দিল এমন নয়। যেমন রেডিয়োর প্রোগ্রাম ডিরেক্টর নতুন শিক্ষার্থীদের সুযোগ দিয়ে টাকা দেওয়া সম্ভব নয় বলে জানিয়ে দেয়। তা শুনে করুণ অম্লান মুখে নীলিমা মুখে বলল- 'কিন্তু আমার কথা শুনলে আপনি 'না' করতে পারবেন না।'[৭] বাস্তবেই দেখা যায় সব শুনে প্রোগ্রাম ডিরেক্টর আর না করতে পারেননি। একটা বিষয় লক্ষ্যনীয় সেখানেই নীলিমার শিল্পধর্মের অর্জিত মূল্য মানুষের স্বীকৃতি পেতে বাধা পেয়েছে সেখানেই নীলিমা নিজের দুঃখের কাহিনি শুনিয়েছে। আসলে ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধের প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা প্রবলভাবে আর্থিক সংকটের সংগ্রামে লিপ্ত এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহবধূ অপরের সহানুভূতির দুর্বলতাটুকে এভাবেই আত্মস্বার্থে কাজে লাগানোর প্রচেষ্টা করেছে তা বুঝে উঠতে খুব একটা অসুবিধা হয় না। নিজের শিল্পবিদ্যার দীনতার শূন্যস্থান নীলিমা আপন অন্তরের দুঃখের কাহিনি শুনিয়ে পূর্ণ করে দিত। তাতে মনে মনে যে গ্লানি বোধ হত না তা নয়, কিন্তু হাতে টাকা আসলে সেই গ্লানি অনেকটাই প্রশমিত হয়ে যেত—

"প্রথম প্রথম স্বামীর রোগের কথা শুনে লোকে তাকে অনুকম্পা ক'রে টাকা দিয়েছে। মাঝে মাঝে একটু খোঁচা লাগত মনে, ক্রমে সেইটাই তার অভ্যাস হয়ে এসেছিল। যেখানে এ রকম বিশেষ পক্ষপাতিত্ব তার জুটত না, নৈপুন্যের অভাব দেখে লোকে তাকে তুচ্ছ করত, অনাদর করত, সে সব জায়গায় নীলিমাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এসে তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিত। বিদ্যায় তার দীনতা থাকলে কি হবে অন্তরে সে সমৃদ্ধ। সে টাকা তুলেছে দুঃস্থ যক্ষ্মা-রোগগ্রস্থ স্বামীর জন্য, নিঃস্ব অর্ধভুক্ত পরিবারের জন্য। তাতে টাকাও আসত, নিজের শিল্পকুশলতার অভাবের জন্য ক্ষোভ এবং গ্লানিও কম হত।"[৮]

তবে শিল্পের চেয়ে প্রয়োজন বড়, আনন্দ বা প্রশংসার চেয়ে টাকা বড় এই বাস্তবিকতাকে মেনে নিলেও মাঝে মাঝে নীলিমার মনেও দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। সমকালীন নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণির বহু শিল্পীমনস্ক মানুষের মনেই এই দ্বন্দ্ব নিত্য সঙ্গী ছিল। নীলিমাও এই দ্বন্দ্বকে নিয়েই সংগ্রাম চালিয়ে টাকা রোজগার করে গেছে। তাই মাঝে মাঝে উপরি

পাওয়া হিসেবে কোন কোন জায়গা থেকে প্রশংসা ছুটে এসেছে বা কোন মুহূর্তে গুনগুন করে গাওয়া পরিচিত কোন গানের কলি মনকে আচমকা দোলা দিয়ে গেছে তখন নীলিমার 'মনে হয়েছে এর সঙ্গে আর কিছুর তুলনা হয় না, সমস্ত কর্তব্য এর কাছে মিথ্যা, সকল উদ্দেশ্য এর কাছে অর্থহীন।'[৯] যদিও এই মোহকে বেশি প্রশ্রয় দেয়নি নীলিমা। বরং 'আদর্শের পথে, কর্তব্যের পথে বাধা বলে বর্জন করেছে তাছাড়া শুধু আদর্শ আর কর্তব্যই তো নয় হৃদয়ের দাবী, প্রেমের দাবী তার মনকে সব সময় আচ্ছন্ন করে রেখেছে।'[১০] তাই অন্যমনস্ক হবার সুযোগ খুব বেশি আসেনি। কিন্তু হঠাৎ উত্তর কলকাতায় জলসা আয়োজন উপলক্ষ্যে একদল ছেলে যখন গান গাইবার আমন্ত্রণ পত্র নিয়ে নীলিমার কাছে আসল তখন নিলিমা অনুভব করল ক্ষুদ্র ব্যক্তি স্বার্থের বাইরেও তার শিল্প প্রতিভার একটা অস্তিত্ব আছে। শহরের সব বড় শিল্পীরা সেখানে আসবেন এবং তাঁদের সাথে নীলিমারও ডাক পড়েছে। সচেয়ে বড় কথা থিয়েটার ভাড়া করে যে জলসার আয়োজন তার থেকে প্রাপ্ত অর্থ যাবে বন্যা পীড়িত দুর্গত-সেবার তথবিলে। ফলে এ এক মহত্তর আয়োজন। এই প্রথম কোথাও অর্থ প্রাপ্তির উদ্দেশ্য ভুলে বৃহত্তর মানবসেবায় আত্মনিয়োগের আহ্বান এল নীলিমার কাছে—

> *"আজ যখন ছোট হৃদয়ের আর ক্ষমতার মাঝে মাপা ক্ষুদ্র সিদ্ধি তার করায়ত্ত প্রায় তখন আহ্বান এল বৃহত্তর জগতের। এল সার্থকতার নতুন অর্থ, মহত্তর সম্ভাবনা। নীলিমা শুনল, তার কৃতিত্ব আছে, নৈপুন্য আছে, তার গান অনেকের সত্যি সত্যিই ভাল লেগেছে, তার সেতার অনুরণন জাগিয়েছে অনেকের মনেই। আর শুধু তাই নয় তার এই দক্ষতা আরও বড় কাজে লাগছে, ব্যাপকতর সেবায় ব্যয়িত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করেছে। সেখানে আসবেন দেশে বড় বড় শিল্পী, যাঁদের অনেকের সে কেবল নামমাত্র শুনেছে। তাঁদের সে আজ স্বচক্ষে দেখবে, গান শুনবে, গান শোনাবে।"*[১১]

কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে নীলিমার বহু আকাঙ্খিত স্বামীর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে আসার দিন সুনিশ্চিত হয়ে যায় জলসায় গান গাইবার দিনটিতে। একদিকে তাঁর ভালবাসার মানুষটির ফিরে আসার আনন্দ অন্যদিকে তাঁর শিল্প-প্রতিভা প্রকাশের সুবর্ণ সুযোগ। তাই 'এক হাতে নীলিমা ঘর গুছাল, ঘর সাজাল, কিন্তু আর এক হাত রইল সেতারের তারে।'[১২] সুবিমল ফিরে আসার পর নীলিমা বুঝতে পারে তার পক্ষে আর জলসায় যাওয়া সম্ভব নয়। 'নীলিমা বাঈজীর ভূতপূর্ব স্বামী ফিরে এসেছে যমের দুয়ার থেকে, যমের হাত থেকে যমদন্ড কেঁড়ে নিয়ে আজ একটি মাত্র জলসা হবে'[১৩] সুবিমল আর নীলিমাতে। যে স্বামীকে সুস্থ করার জন্যই নীলিমার সঙ্গীত সাধনা, তা যেন সার্থক, আজ আর তাই বাইরে বেরোনোর কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু আজ প্রয়োজনের উর্ধ্বে উঠে নীলিমার শিল্পীসত্তা আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য ব্যকুল হয়ে ওঠে। তাই সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ তার কাছে 'নিজের সেতার বাজনার চেয়েও যেন মধুর আর অপূর্ব'[১৪] মনে হয়। একদিকে দাম্পত্য সম্পর্কের পিছুটান অনুদিকে শিল্পী মনের আবেগ জনিত দ্বন্দ্ব সংকটের মাঝে নীলিমা শেষ পর্যন্ত নিম্ন-মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের এক কূললক্ষ্মী রূপে স্বামীর অনুরোধে সেতারটা হাতে তুলে নেয় কারণ, 'তাকে আজ বাজাতেই হবে।'[১৫] এবং সেই বাজনার সুর নীলিমার 'নিষ্প্রভ শুন্য দৃষ্টি'[১৬] -র যন্ত্রণার সঙ্গে মিশে অনুরণিত হয় সমস্ত পাঠকের হৃদয়ে। তাই গল্পের শেষে দাম্পত্য সম্পর্কের টানাপোড়েনের মাঝে এক শিল্পী মনের বেদনা আমাদের মনে দাগ কাটে যায়।

ভয়ানক আর্থিক সংকট থেকে পরিবারকে রক্ষা ও সুবিমলের চিকিৎসার জন্য নীলিমার যে লড়াইয়ের ছবি গল্পে ফুটে ওঠে তার মাঝে বিবিধ চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক গুলিকে একটু অনুধাবন করলে চল্লিশের দশকের সমকালীন নিম্ন-মধ্যবিত্ত চরিত্রগুলির স্বরূপ অনেকটাই উন্মোচিত হয়ে ওঠে—

কালীমোহন-মনোরমা ও নীলিমা:

শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টি মধ্যবিত্তের জীবন সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। প্রায় প্রতিটি বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারেই অতি প্রাচীন কাল হতে বিবিধ নিয়মতন্ত্র তথা সংস্কার-রীতির প্রথানুগত্যে এই সম্পর্ককে

মান্যতা দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু চল্লিশের দশকের কঠিন সময়ে এই মধ্যবিত্তের সংস্কারপন্থীতা ও প্রাচীন মূল্যবোধগুলির ওপর কঠিন আঘাত আসে। তাই বাধ্য হয়েই পুরোনো নিয়মের বাধা ছক ভেঙে নতুন নিয়মের সঙ্গে ব্যক্তি চরিত্রগুলি নিজেদের মানিয়ে নেয় বা নিতে বাধ্য হয়। তাই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমরা দেখি, 'যে শ্বশুর-শাশুড়ী বিয়ের পর মাত্র কয়েকটি মাসের জন্য পুত্রবধূকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষাটা দিতে দেননি, ছেলের বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে মেলা-মেশায় আপত্তি করেছেন তাঁরও যে আজ নীলিমাকে অর্থ উপার্জনের অনুমতি দিতে পারেন'[১৭], এবং তা সুবিমল সহ সাধারণ পাঠকের কাছেও অবিশাস্য ঠেকে না। প্রবল আর্থিক সংকটের সামনে টিকে থাকার লড়াইয়ে নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারটি বাধ্য হয়েছে প্রাচীন সংস্কারকে ঝেড়ে ফেলতে। তবে এই মানিয়ে নেওয়া যে দ্বিধা-হীন ভাবে হয়েছে তা নয়। কালীমোহন-মনোরমার সেই দ্বিধার মধ্যেই সমকালীন মধ্যবিত্ত সমাজের সংস্কারের বিষয়টি উঠে আসে। বাইরে গিয়ে চাকরি করা প্রসঙ্গে নীলিমার সঙ্গে তাদের কথোপকথনে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে—

> *"কালীমোহন তবে আমতা আমতা করলেন, বললেন, 'লোকে কি বলবে !'*
> *মনোরমা বললেন, আর সেসব যদি আমার সবুর কানে যায় তাহলে তারই বা কেমন লাগবে।"*
> *...নীলিমা জবাব দিল, 'অত ভাবছেন কেন মা, আজকাল কত মেয়েই এমন তো করছে, এতে নিন্দার কিছু নেই। আর নিন্দা-বন্দনার দিকে কান দেওয়ার এই কি সময় ?'*
> *অন্য কোন সময় হলে পুত্রবধূর মুখে এই সব ছাপার অক্ষরের বড় বড় কথা মনোরমা সহ্য করতেন না, কিন্তু এখন চুপ করে রইলেন।*
> *রেখাই প্রথম পরিচয় করিয়ে দেবার ভার নিল। নির্দিষ্ট দিনে এসে বলল, 'চল ঠাকুর ঝি।'*
> *পায়ে পুরনো একজোড়া স্যান্ডাল, পরনে অনেক কাল আগের রঙ ফিকে হয়ে যাওয়া একখানা শাড়ি। রেখা তার দিকে তাকিয়ে কি যেন বলি বলি করে চুপ করে গেল।*
> *নীলিমা শ্বশুরের সামনে গিয়ে বলল, 'তাহলে আসি বাবা।'*
> *কালীমোহনের কণ্ঠ আদ্র হয়ে এল, বললেন 'এসো মা। নিতান্তই দুর দৃষ্ট না হলে কুললক্ষ্মী তুমি, তোমাকে আজ বেরোতে হয় টাকার চেষ্টায়।'*
> *নীলিমা বলল, 'কিন্তু এ সময় ঝি-গিরিতেও যে আমার অপমান নেই বাবা।'*
> *কালীমোহন বললেন, 'তবু আমি বেঁচে থাকতে-'*
> *নীলিমা মৃদু কণ্ঠে বলল, 'আপনি বিচলিত হবেন না বাবা।'*
> *কালীমোহন বললেন, 'না আর বিচলিত হব কেন। আশীর্বাদ করি তোমার কষ্ট যেন সার্থক হয়।'*[১৮]

আসলে তৎকালীন সময়ে মধ্যবিত্ত সমাজে কোন বাড়ির কুলবধূ বাইরে গিয়ে চাকরি করবে, তা ছিল মধ্যবিত্তের সামাজিক সংস্কারের বিরোধী। যদিও বাস্তব পরিস্থিতি মধ্যবিত্ত পরিবারের অনেক কুললক্ষ্মীকেই সেদিন বাইরে গিয়ে কাজ করতে বাধ্য করেছিল।

সুবিমল-নীলিমা (স্বামী-স্ত্রী):

মধ্যবিত্তের নিবিড় ভালোবাসার সম্পর্কের প্রতিনিধি রূপে এসেছে সুবিমল ও নীলিমার দাম্পত্যের কাহিনি। তবে ভালোবাসার সেই নিবিড়তার মাঝেই মধ্যবিত্তের সংস্কার, স্বার্থবাদীতার বিষয়গুলিও উঁকি দিয়েছে। প্রাথমিক অবস্থায় স্ত্রীর বাইরে গিয়ে চাকরি বিষয়ে সুবিমলের সংস্কারগ্রস্থ মনের দ্বিধা ধরা পড়ে। তাই সুবিমল নিলিমার উদ্দেশ্যে বলে, 'কুটুম্ব-স্বজনের বাড়িতে শেষ পর্যন্ত গানের মাস্টারীও গিয়ে করতে হবে তোমাকে ?'[১৯] তবে এই দ্বিধা বেশিক্ষন স্থায়ী হয়নি। তাই আর্থিক সংকটের বাস্তবতা তাকে বাধ্য করে স্ত্রীকে সেই সম্মতি দিতে- 'অন্যেক কাছ থেকে ভিক্ষে নেওয়ার চেয়ে তোমার রোজগার আমি সহজেই নিতে পারব।'[২০] কিন্তু সুবিমল স্ত্রীর শিল্প প্রতিভাকে নিজ আর্থিক সংকট থেকে উত্তোরণের স্বার্থে ব্যবহার করলেও, সেই স্বার্থ পূরণ হয়ে গেলে স্ত্রীর শিল্প প্রতিভা প্রকাশের মহত্তর

সম্ভাবনাকে সজ্ঞানে প্রকাশিত হতে দেয়নি। সেক্ষেত্রেও নিজ স্বার্থে ভালোবাসার দাবিতে স্ত্রীকে জলসায় যেতে না দিয়ে, কাছে রাখতে চেয়েছে সুবিমল। তবে সেই ভালোবাসার আড়ালে স্ত্রীর উপর দেবতা স্বামীর সনাতন অধিকার ও আধিপত্যের বিষয়টি অপ্রকাশিত না হয়ে থাকে না। নীলিমাকেও সেই অধিকারের দাবিকে মেনে নিতে হয়, তাই সঙ্গীতের আসরে তার আর যাওয়া হল না। 'কিন্তু তার এই থাকাটাই কি পুরোপুরি থাকা ?'[২১]-এই প্রশ্নটা আমাদের মনে উঁকি দিয়ে যায়।

বিংশ শতকের মাঝামাঝি কলকাতার মেট্রোপলিটন শহরের জীবনযুদ্ধে সংসারের প্রয়োজনেই বাইরে গিয়ে চাকুরিরতা এক নারীর ভিন্নধর্মী দাম্পত্য সংকটের গল্প হল **'অবতরণিকা'** (১৩৫৬ বঙ্গাব্দ)। 'সেতার' গল্পের নীলিমার মতো 'অবতরণিকা'র আরতিকেও বাইরে গিয়ে চাকরি করতে হয়েছে নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারটির দৈনন্দিন মৌলিক চাহিদাগুলিকে পূর্ণ করার জন্যে। কিন্তু স্বাবলম্বী হবার প্রশ্নে আরতিকে প্রতি-মুহূর্তে লড়াই করতে হয়েছে মধ্যবিত্তের সনাতন সামাজিক সংসার ও পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার বিরুদ্ধে।

অর্থ কিভাবে মানুষের বিবেক, সংস্কার, চরিত্র ও জীবনকে দেখবার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দেয় তার সার্থক দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে গল্পটি। মধ্যবিত্ত পরিবার গুলিতে আর্থিক সংকটের দায় সেভাবে সৃষ্টি না হলে সাধারণত সনাতন বংশজাত সংস্কারগুলো বিশেষ ভাবে ক্রিয়াশীল থাকে। তখন তাদের কাছে মনে হয় 'টাকার চাইতেও বড় প্রেস্টিজ্, বড় পারিবারিক শান্তি।'[২২] তাই আরতির বাইরে গিয়ে চাকরি করার বিষয়টি স্বামী সুব্রত, শ্বশুর প্রিয়গোপাল বা শাশুড়ী সরোজিনী কেউই ভাল চোখে দেখেনি। পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ির বৌ-এর বাইরে গিয়ে চাকরি করে রাত করে ঘরের ফেরার বিষয়টি তৎকালীন ভদ্রয়ানার প্রচলিত সংস্কারের বিরোধী। তাই আরতি চাকরি প্রসঙ্গে সুব্রত, প্রিয়গোপালের ও সরোজিনীর উল্লেখিত বিবিধ মন্তব্যগুলি পর্যালোচনা করলে প্রচলিত পরম্পরাগত মধ্যবিত্ত বাঙালির সংস্কারের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে—

(শ্বশুর) প্রিয়গোপালের মন্তব্য:

(ক) 'আমি বেঁচে থাকতে মজুমদার বাড়ির বউ চাকরি করবে, আর আমি তা চোখ মেলে দেখব ?' [২৩]
(খ) 'এত রাত্রি অবধি কোন্ গৃহস্থের বউ বাইরে থাকে ! এমন যে হবে, আমি আগেই জানি। আস্তাবলের ঘোড়া আর ঘরের বউ-ঝি'র রাশ যদি একবার ছেড়ে দেওয়া যায়—' [২৪]

(শাশুড়ি) সরোজিনীর মন্তব্য:

(ক) 'বেশ করুক বউ চাকরি। আমি কিন্তু এখানে আর থাকব না। মাকে তাহলে পটলডাঙ্গায় দিয়ে এস। [২৫]
(খ) 'এই বোধহয় এলেন আমাদের মহারাণী। রাত আটটার সময় ঘরের লক্ষ্মীর ঘর- সংসারের কথা মনে পড়ল।' [২৬]

(স্বামী) সুব্রত মন্তব্য:

(ক) 'যে অফিসের কাজে রাত আটটা অবধি তোমাকে বাইরে থাকতে হয়, বাড়ির কারো সুবিধা-অসুবিধা অসুখ-বিসুখ পর্যন্ত দেখা চলে না, তেমন অফিস তোমাকে কিছুতেই করতে দেব না আমি।' [২৭]

উক্ত মন্তব্যগুলি মধ্যে মধ্যবিত্ত পরিবার গুলির অন্তঃপুরে থাকা কুল বধূদের স্বাধীনতার সীমা, কর্তব্য-অকর্তব্যের পরিধির বিষয়ে একটা ধারণা অবশ্যই করে পাওয়া যায়। টাকা সংসারে প্রয়োজনীয় হলেও সুব্রত চায়নি যে স্ত্রী আরতি 'শুধু একটা টাকা-আনা-পাইয়ের থলি হয়ে থাক।'[২৮] আসলে সাংসারিক মৌলিক চাহিদা পূরণের মত অর্থসংকটের দায় তেমন না থাকাতেই এই কথাগুলো সুব্রতর মুখ থেকে বেড়িয়েছে। কিন্তু যখন পেট চালানোর মত অর্থের সংকট তৈরী হয় তখন মধ্যবিত্তের এই সনাতন সংস্কারগুলি অনেকটাই আলগা হয়ে যায়। তাই যে সুব্রত, স্ত্রীর

চাকরি নিয়ে আপত্তি তুলেছে সেই ছয় মাস আগে নিজেই গরজ দেখিয়ে স্ত্রীর চাকরি বিষয়ে উৎসাহ জুগিয়েছে। তখন অফিস যে মাইনে পেত তা মাসের পনের দিন যেতে না যেতে নিঃশেষ হয়ে যেত। 'ফলে পরের দুই সপ্তাহের রেশন আর বাজারের টাকাটা সংগ্রহ করতে প্রতি মাসে প্রাণান্ত হয় সুব্রতর।'[২৯] সেই সময়ে সংসারের পোষ্য অনেক হলেও রোজগেরে ছিল সে একাই। স্বামী-স্ত্রী, দুই ছেলে মেয়ে, মা, বুড়ো বাপ ও ছোট তিনটে ভাইবোন মিলে এক বৃহৎ যৌথ সংসার চালানো সুব্রতর পক্ষে দুষ্কর হয়ে উঠেছিল। তারপর আবার প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ পঁয়তাল্লিশ টাকা গুনতে হত। সেই সঙ্গে অসুখ-বিসুখ, লোক-লৌকিকতা ত আছেই। আসলে এই দৃশ্যটা শুধু সুব্রত একার পরিবারের চিত্র নয়। দেশভাগের পরবর্তীতে পূর্ববঙ্গ থেকে উঠে আসা কলকাতায় শহরতলির ভাড়া বাড়িগুলির বেশির ভাগ নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারগুলি ভেতরের চিত্রটা তেমনি ছিল। সেই অর্থসংকট থেকে বাঁচতে, পেটের তাগিদে সেদিন বহু ভদ্র ঘরের বাঙালি কুললক্ষ্মীদের ঘরের বাইরে বেড়িয়ে চাকরি করতে হয়েছে। তাই বন্ধু পরিমলের স্ত্রী মাধুরীর চাকরির খবর স্ত্রী আরতিকে শুনিয়ে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছে সুব্রত। সেইসঙ্গে এমনই 'আরো কয়েকজন বন্ধু-পত্নীর চাকরির খবর দিয়েছে সুব্রত। কারো মাস্টারি, কারো কেরানীগিরি।'[৩০] এবং সব শেষে মধ্যবিত্তের বংশ পরম্পরাগত সমস্ত সংস্কারকে অমান্য করে নিজের মুখে সুব্রত, স্ত্রীকে চাকরি করে সংসারে টাকা আনার কথা বলেছে—

> *"পুরুষ হোক, মেয়ে হোক, আজকাল বসে খাওয়ার কি জো আছে কারো? চেষ্টা চরিত্র করে তুমিও যদি একটা জোটাতে পারতে মন্দ হত না। বিশ হোক, পঁচিশ হোক, যা আনতে, তাতেই সাহায্য হোত আমার।"*[৩১]

আমরা দেখি স্ত্রীর চাকরির চেষ্টায় নিজেই পেপারের বিজ্ঞাপন খুঁজেছে, এবং আবেদন পাঠিয়েছে সুব্রত। প্রয়োজনে বাবা-মা'র অমতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, স্ত্রীকে চাকরির ইন্টারভিউতে এগিয়ে দিয়ে এসেছে, স্ত্রীর প্রথম বেতনের টাকায় দামি সিগারেটে সুখটান দিয়েছে। কিন্তু ক্রমশ সময়ের সঙ্গে সুব্রতর মিডিল ক্লাস মেন্টালিটির ধ্যানধারণায় দ্বিধা, সংশয় তৈরী হয়েছে। চাকরি করতে গিয়ে আরতির ট্রামে-বাসে বড় বেশি ঘোরা, অচেনা স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গে মেশা, রাত করে বাড়ি ফেরা ইত্যাদি মধ্যবিত্তের সনাতন ভদ্রয়ানার সংস্কারে ধাক্কা দিয়েছে। আসলে ব্যাঙ্কে চাকরি আর নতুন করে জোটানো পার্ট টাইমের টাকায় সংসার ভাল মত চলে যাবে মনে করেছে সুব্রত। তাই এখন আরতির চাকরির টাকায় তেমন প্রয়োজন নেই। সুতরাং মধ্যবিত্তের সনাতন ট্রিপিক্যাল সংস্কার গুলি যে জেগে উঠবে তাই স্বাভাবিক। শ্বশুর ও শাশুড়ির সঙ্গে সুব্রতও শেষ পর্যন্ত আরতির চাকরি করার বিষয়ে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু মুহূর্তেই ঘটনাক্রম বদলে যায় ব্যাঙ্ক বসে যাওয়াতে সুব্রত রোজগারহীন হয়ে পড়ে। আরতি চাকরি টাকাই শেষ পর্যন্ত হয়ে সংসারের চালিকা শক্তির মূল উৎস। তাই পুনরায় পেট চালানোর সংকটে মধ্যবিত্তের পুরাতন সংস্কারবোধ গুলি আলগা হয়ে পড়ে। শুধু সংস্কার নয়, প্রয়োজনে এই শ্রেণিটি নিজের আত্মসম্মান বোধও হারাতে কুণ্ঠিত হয় না। তাই সহকর্মী এডিথের অপমানে আত্মসম্মানী আরতি চাকরি ছেড়ে দিলে সুব্রত সহ বাড়ির কেউ-উ তা মেনে নিতে পারে না। পরের জন্য প্রতিবাদী হওয়া, আত্মসম্মান রক্ষা ইত্যাদি মূল্যবোধ গুলি অর্থের অভাবে নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণি চরিত্র গুলি থেকে কিভাবে হারিয়ে তার সার্থক উদাহরণ 'অবতরণিকা' গল্পটি। তাই তো বাইরে গিয়ে চাকরিতে অপছন্দ করত যারা, সেই চরিত্রগুলির নতুন স্বরূপ ধরা পড়ে অর্থসংকটের মধ্যে আরতির চাকরি ছেড়ে দেবার দুঃখে—

> *"সরোজিনী বঁটিতে কুটনো কুটতে কুটতে নিজের মনেই বলতে লাগলেন, 'আর এই কি আমাদের মেজাজ দেখাবার গোঁয়ার্তুমি করবার সময় ? এমন চাকরি নেওয়াই বা কেন, আর ছাড়াই বা কেন ? কিছু বুঝিনে বাপু।'*
> *সুব্রত কাছেই চুপ করে বসেছিল, মার দিকে তাকিয়ে অদ্ভূত একটু হাসল। 'সবচেয়ে মজার কথা মা, সত্যি সত্যি যাকে অপমান করেছে সে হয়ত দিব্যি সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে অফিস হাজির হয়ে এতক্ষন কাজও শুরু করে দিয়েছে। সে তো আর সেন্টিমেন্টাল বাঙ্গালী মেয়ে নয়।"*[৩২]

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের **'হেডমিস্ট্রেস'** (১৩৫৭) গল্পেও দেশভাগের পরবর্তীতে নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির অর্থসংকটের চিত্র উঠে এসেছে। এবং সেই অর্থসংকট থেকে বাঁচতে বহু মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা চাকরি করতে বাধ্য হয়েছিল। আলোচ্য গল্পে কেরাণী শৈলেনে'র স্ত্রী এক বালিকা বিদ্যালয়ের হেডমিস্ট্রেস। বন্ধুবান্ধব, পাড়ার মুদির দোকানের ধার বাকীতে জর্জরিত সুব্রত 'মাসিক মাইনেটি প্রথম দশ দিনের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে'[৩৩] গেলে সংসার চালানোর জন্যে তখন ভরসা করতে হয় স্ত্রীর মাস্টারীর টাকায়। সংসারে অর্থের টানাটানি থাকলেও তা কিন্তু দাম্পত্য সংকটের কারণ হয়নি। শৈলেন-সুপ্রীতির দাম্পত্য সংকটের মূল কারণ সামাজিক ক্ষেত্রে পুরুষের ব্যক্তি-পরিচয়ের প্রাধান্য জনিত ইগো। বিদ্যায়, বুদ্ধিতে আর টাকা রোজগারে শৈলেন, সুপ্রীতির চেয়ে এগিয়ে থাকলেও তবু তার সামাজিক পরিচিতির জায়গাটি হল সে হেডমিস্ট্রেসের স্বামী। পাড়ার লোকেরা সহ বৃহত্তর সমাজ তাকে সেই পরিচয়েই বেশি চেনে। এইভাবে স্ত্রীর পরিচয়ে বাঁচতে চায়নি শৈলেন। এইরূপ পৌরুষত্বের মাথা নত হওয়ার বিষয়টি মেনে নিতে পারেনি সে কোনভাবেই। ঠিক এই জায়গা থেকেই স্ত্রীর প্রতি বিদ্বেষ ও দাম্পত্য সংকটের শুরু শৈলেনের জীবনে—

> *"হেডমিস্ট্রেসের স্বামী। এ পাড়ায় এই তার একমাত্র পরিচয় হয়ে দাঁড়িয়েছে আজকাল। স্কুলের ছাত্রীরা, তাদের অভিভাবকেরা, টিচারের আর তাদের স্বামীরাই নয়, গোয়ালা, মুদি, কয়লাওয়ালা, রেশন শপের মালিক পর্যন্ত তাকে ওই পরিচয়েই চেনে। বাসা হেডমিস্ট্রেসের, সংসার হেডমিস্ট্রেসের, স্বামী হেডমিস্ট্রেসের। এ পাড়ায় সুপ্রীতি মুখুয্যে সর্বাধিক জনপ্রিয়া। প্রায় আধানেত্রী গোছের মহিলা। আর শৈলেন শুধু সুপ্রীতির স্বামী, স্ত্রীনাম-ধন্য পুরুষ, অথচ বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, উপার্জনে শৈলেন সুপ্রীতির চেয়ে অনেক ওপরে, তবু এখানে সে অখ্যাতনামা, প্রায় অজ্ঞাতনামা। এ পাড়া ছেড়ে দিতে হবে শৈলেনকে, সুপ্রীতিকে ছাড়িয়ে নিতে হবে। আশ্চর্য, সুপ্রীতিও যেন চায় না শৈলেন এ পাড়ায় পরিচিত হোক, তাকে লোকে জানুক, চিনুক, নিজের খ্যাতির আড়ালে স্বামীকে যেন সে সরিয়ে রাখতে চায়। স্ত্রীর ওপর অদ্ভূত এক ধরণের বিদ্বেষবোধ করল শৈলেন।"*[৩৪]

অথচ এক সময় এই সুপ্রীতির নামটা পৃথিবীর কাছে বিখ্যাত করে তোলার জন্য কি না করেছে সে। তখনও বিয়ে হয়নি। সুপ্রীতির নামকে বড় করে তোলার জন্য সেই সময় ছাপার অক্ষরে তার নামে কবিতা লিখেছে শৈলেন। এই নিয়ে সুপ্রীতি প্রতিবাদ করলে উল্টে শৈলেন জানিয়েছে– 'ও নামটা কি কেবল তোমারই। এতে আমার স্বত্ব আরো বেশি।'[৩৫] কিন্তু সেই প্রেমিক মধ্যবিত্তেরই ভিন্ন স্বরূপ ধরা পড়ে যখন সে বিবাহিত, যখন সে সুপ্রীতির স্বামী। শুদ্ধ ভালবাসার সম্পর্কে প্রেমিকার নাম-ডাক, খ্যাতিকে হৃদয়ে যে প্রসন্নতা জাগে মধ্যবিত্তের জটিল দাম্পত্য সম্পর্কে তা অন্তর্হিত হয়। এই সম্পর্কের স্বাভাবিক রীতিটি হল স্ত্রী দাসী রূপে স্বামী নামক পুরুষ দেবতার পদানত হয়ে থাকবে এবং সে পরিচিত হবে অমুকের স্ত্রী, অমুকের ছেলের মা ইত্যাদি রূপে। সেই স্বাভাবিকতার বাইরে গিয়ে যখন স্ত্রীর পরিচয় নিয়ে বাঁচতে হয় তখন মধ্যবিত্ত বাঙালি পৌরুষের অন্তরে জ্বালা ত সৃষ্টি হবেই। শৈলেন চরিত্রের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়েছে। ঘরে-বাইরের বাস্তবিকতায় স্ত্রীর ব্যক্তিত্ব বড় হয়ে দেখা দিলে প্রতি মুহূর্তে অপমানের যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়েছে শৈলেনের পুরুষত্ব। তাই দেখি স্কুলের সেক্রেটারী অনুকূল বাবুর সঙ্গে স্ত্রীর সম্পর্ক আপাতভাবে পছন্দ না হলেও যখন স্ত্রীর প্রবল প্রতাপ ব্যাক্তিত্ব অনুকূল বাবুর কাছে বিনীত হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন তা আনন্দ দিয়েছে শৈলেনের পুরুষ হৃদয়কে—

> *"ফিকে হলদে রঙের শাড়ি প'রে পিঠ ভ'রে একরাশ চুল ছড়িয়ে সেক্রেটারীর টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে সুপ্রীতি। দীর্ঘ তনুদেহ বিনয়ে আনম্র। ভঙ্গিটি অনুরক্তার না হোক, অনুগৃহীতার। মনে মনে হাসল শৈলেন, কোথায় সেই হেডমিস্ট্রেসী প্রতাপ। পুরুষের কাছে মাথা নোয়াতে হয়েছে স্ত্রীলোক-কে। মুহূর্তের জন্য অনুকূল সরকারের সঙ্গে এক ধরণের সান্নিধ্য, অভিন্নতা অনুভব করল শৈলেন।"* [৩৬]

পরপুরুষের কাছে আপন স্ত্রীকে মাথা নোয়াতে হলেও তাতে পুরুষত্বের জয় এবং তা থেকে শৈলেনের মনে যে আনন্দ উপলব্ধি তা বাঙালি মধ্যবিত্তের বিকৃত পৌরুষ চেতনার অন্তঃসার শূন্যতাকেই প্রদর্শন করে। অন্যদিকে সুপ্রীতি চরিত্রটি স্ত্রী হিসেবে, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে যথেষ্ট দায়িত্বশীল চরিত্র। সর্বোপরি তৎকালীন সময়ের মূল্যবোধের অবক্ষয় পর্বে যখন প্রায় সব মধ্যবিত্ত চরিত্রগুলির নিজ স্বার্থ পূরণে ব্যস্ত, ঠিক তখন দয়াপরবশ সহানুভূতি ও মানবিকতার গুণে উজ্জ্বল এক চাকুরিরতা শিক্ষিতা চরিত্র রূপে উপস্থিত হয়েছে সে। আমরা দেখি স্কুলের টিচারদের দু-মাসের মাইনে বাকী থাকা সত্বেও স্কুল সেক্রেটারী যে চেক সই করেছে তাতে সবার এক মাসের পুরো বেতন দেওয়া সম্ভব নয়। এমতবস্তায় নিজের প্রয়োজনের কথা ভুলে অন্যের প্রয়োজনকে বড় করে দেখতে গিয়ে নিজের প্রয়োজনের প্রায় সব মাসিক বেতনের টাকা দিয়ে দেয় সুপ্রীতি—

> *“প্রথমে নিজের এক মাসের মাইনেটা আলাদা করেই রেখেছিল সুপ্রীতি। কিন্তু বেশিক্ষণ রাখতে পারেনি। অঙ্কের টিচার অমলা দত্ত প্রায় কাঁদো কাঁদো হবার জো, ‘এই চল্লিশ টাকায় আমার কি হবে দিদি। ওঁর যে সাংঘাতিক অসুখ। ডাক্তারেরই যে অনেক টাকা পাওনা। আরও অন্তত গোটা কুড়ি টাকা আমাকে দিন। আমার কাছে এর পর থেকে আর কোন গাফিলতি পাবেন না। খুব খেটে পড়াব।’ পনের টাকা সে না নিয়ে ছাড়ল না। তারপর এল নীলিমা রায়। রেখা ভৌমিক, উমা চন্দ্র। কারো স্বামীর চাকরি নেই, কারো বাবার মাইনে কাটা গেছে। সকলেরই ধারে-দেনায় অসুখে-বিসুখে অচল। রমা বসু, সবিতা সেন, ললিতা চক্রবর্তীরও একই দশা। শৈলেনের দিকে তাকিয়ে রাসমণি বলল, ‘দাদাবাবু, এমন বোকা মেয়েমানুষ আমি আমার বাপের জন্মেও দেখিনি। দিতে দিতে সব শেষ। ...ফুরুতে ফুরুত্রে শেষে যখন গোটা পাঁচেক টাকা বাকি, আমি হাত চেপে ধরলাম্- কর কি দিদিমণি। কালই যে হাঁড়ি চড়বে না। রেশনের টাকাটা অন্তত রাখ।*[৩৭]

আসলে এভাবেই স্বার্থসর্বস্ব মধ্যবিত্ত সমাজের মাঝে ব্যতিক্রমী হয়ে ওঠে সুপ্রীতির। এবং শেষ পর্যন্ত সুপ্রীতি এই উদারতার মধ্যেই স্ত্রীর প্রতি বিশ্বাস ও ভালবাসার উন্মীলনের মধ্য দিয়ে দাম্পত্য সংকটের সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছেন গল্পকার।

চল্লিশের সমকালীন সময়ে বাস্তবতার মটিতে দাঁড়িয়ে নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণির এক চাকুরিরতা নারীর প্রেম-মনস্তত্ত্বের এক ভিন্ন স্বরূপ অঙ্কিত হয়েছে **‘চেক’** গল্পে। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ‘বিকল্প’ গল্পের মতো প্রেম এখানে শুদ্ধাচারী নয়। নিত্য দিনের ধোঁকাবাজির আগুনে দগ্ধ হয়ে প্রেম এখানে অনেকটা আবেগ শুন্য হয়ে ব্যক্তি জীবনের চাহিদা পূরণের উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। গল্পের নায়িকা সরসী দত্তের বাড়ির অবস্থা মোটেই ভাল নয়। বৃদ্ধ রুগ্ন বাপ আগে চাকরি করত এক মার্চেন্ট অফিসে কিন্তু হিসাবপত্র সামান্য গোলমাল হওয়ার দরুণ সে চাকরি যায়। তারপর থেকে অসুখ-বিসুখ ইত্যাদি কারণে তার আর চাকরি করা হয়ে ওঠেনি। অন্যদিকে স্বামীর সঙ্গী ঘর করতে না পেরে দিদি অতসীও ছেলেকে নিয়ে বাপের বাড়িতে চলে এসেছে। তাই খানিকটা বাধ্য হয়েই পরিবারকে টানতে সরসীকে বাড়ির বাইরে গিয়ে চাকরি নিতে হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এখানেও চল্লিশের দশকের মধ্যবিত্ত মনন আপন ভদ্রয়ানার সংস্কার বশত নারী হয়ে সরসীর বাইরে গিয়ে চাকরিতে আপত্তি করেছে—

> *“প্রথমে অবশ্য খুব আপত্তি করেছিলেন সরসীর বাবা। মেয়েকে কিছুতেই পুরুষদের অফিসে চাকরি করতে দিতে চাননি। বলেছিলেন, না খেয়ে মরবেন, আধপেটা খেয়ে থাকবেন সেও ভালো, তবু মেয়েকে আগুনের মধ্যে আর পাঠাবেন না।”*[৩৮]

কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজের সঙ্কল্প ধরে রাখতে পারেননি সরসীর বাবা। কারণ যে কোনো মানুষের কাছেই ‘না খেয়ে মরা সহজ নয়, আধপেটা খেয়ে থাকা আরও কঠিন।’[৩৯] আর এই আধপেটা খাওয়ার কঠিন সময়ে মধ্যবিত্তের ভদ্রয়ানার সংস্কার গুলি সব জানালা দিয়ে পালিয়ে যায়। তাই ইচ্ছার বিরুদ্ধে, রুচির বিরুদ্ধে অবশেষে ছেড়ে দিতে

হয়েছে মেয়েকে।’[৪০] প্রথমে পাড়ার হাইস্কুলে মাস্টারি তারপর তা ছেড়ে কলকাতার ক্লাইভ রোডের এক নামজাদা সদাগরী অফিসে টাইপিস্ট। মাসিক মাইনে প্রায় আশি টাকা। তবে ‘ঠিক যোগ্যতার জোরে নয়, অনুকম্পা আর সহানুভূতির পাত্রী হয়েই সরসী অফিসে ঢুকেছিল।’[৪১] তার চাকরি হবার পেছনে ছিল কোম্পানীর এক মহিলা অর্গানাইজারের সুপারিশ। এ প্রসঙ্গে বলা যায় বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি যেখানেই যোগ্যতার প্রশ্নে আটকে গেছে সেখানেই নিজ স্বার্থ অন্যের সুপারিশ ও অনুকম্পাকে ব্যবহার করেছে। বহু অতীতকাল হতে এটি এই শ্রেণির খুব সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

একাধিক পুরুষের মাঝে একজন লেডি টাইপিস্ট হিসেবে কাজ করতে গিয়ে প্রাথমিক ভাবে আড়ষ্টতা ও ইতস্ততার সম্মুখীন হতে হয়েছে ঠিকই তবে নিজ ব্যক্তিত্বের গুনে এবং সহকর্মী সুবিমলের সাহচর্যে সরসী তা কাটিয়ে উঠেছে খুব সহজেই। ধীরে ধীরে এই সুবিমলের সঙ্গে এক রোমান্টিক প্রেমের সম্পর্ক রচিত হয় সরসীর জীবনে। সুবিমলের প্রেম সরসীর চাকরি জীবনের একাকীত্বকে ঘোচানোর পাশাপাশি তাকে তার কর্মজীবনে যথেষ্ট স্বাবলম্বী করে তোলে। কিন্তু সরসীর কাছে প্রেম ছিল জীবনের বড় লক্ষ্যকে পাবার উপায় মাত্র। তাই সুবিমলের নিখাদ ভালোবাসাকে উপেক্ষা করে সময়-সুযোগ বুঝে অন্য কোনো লক্ষ্যবস্তু স্থির করতে তার বাধে না। তারপরে প্রেম মাধ্যমটা যদি একগুচ্ছ উপহার ও আর্থিক পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসে আর পাত্রটা যদি হয় কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার তবে নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের এক মেয়ের কাছে সেই লোভ সামলানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। ম্যানেজার নবনী চ্যাটার্জির কাছে প্রেম নামক বস্তুটি যে দৈহিক বাসনাকে চরিতার্থ করার নামান্তর মাত্র তা জেনেও সরসী স্বেচ্ছায় প্রেম-প্রেম খেলা করে দেহ দিয়েছে। তারপরে সেই খেলার পাপের চিহ্নকে নিজ গর্ভ হতে প্রয়োজনানুসারে মুছে দিয়েছে সরসী। তারপর সেই প্রেমের খেলার শেষে নবীন চ্যাটার্জির বিয়ে ঠিক হয় দক্ষিণ কলকাতার প্রখ্যাত ব্যাঙ্কারের মেয়ে মমতা মুখার্জীর সঙ্গে। তবে এই সমস্ত কিছুর শেষে সরসী কিন্তু ঠকে যায়নি। সে দর কষাকষি করে আপনার পাওনাটা আদায় করে নিয়েছে ঠিক। আসলে নিজের প্রত্যক্ষ জীবন অভিজ্ঞতায় সরসী উপলব্ধি করেছে প্রেম-ভালোবাসা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিম্ন-মধ্যবিত্ত নারীদের ঠকিয়ে দিয়ে যায়। তার নিজের দিদির জীবনটাই এর সব চেয়ে ভাল উদাহরণ। তাই সরসী জানিয়েছেন—

> *“ছেলেবেলা থেকেই মনে মনে ভাবতাম- পাড়ার সাধারণ মেয়েদের মত হব না, অন্যরকম হব। অনেক দূর অবধি পড়ব, অনেক বড় চাকরি করব। কিছুতেই দিদির মত ঠকব না। প্রথম প্রথম ভারি হিংসা হত দিদিকে, আমার চেয়ে সবাইর কাছে ঢের বেশি তার আদর। খুব হিংসা করতাম তাকে। তারপর বড় হয়ে দেখলাম সে বোকা। যত বেশি সুন্দর, তত বেশি বোকা। তার বোকামির সুযোগে আমাদের আত্মীয় ঠকিয়ে গেল।*
> *...সরসী বলে চলল, অনেক টাকা, অনেক গয়না-গাঁটি ঘুষ নিয়ে ঠকালেন জামাইবাবু। প্রথমে বললেন ওসব মাইন্ড করেন না, কিন্তু ছেলে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গয়না-গাঁটি কেড়ে রেখে তাড়িয়ে দিলেন।”*[৪২]

তাই কোনভাবেই পুরুষের প্রেমে ঠকতে চায়নি সরসী। বাইরের চাকরি জীবনে অনেক পুরুষ তার কাছে ঘেঁষতে চেয়েছে। কোথাও এড়িয়ে গিয়ে, বা রুখে দাড়িয়ে বা অভদ্রতার ভান করে, কোথাও বা প্রেমের অভিনয় করে জীবন তৈরী করতে চেয়েছে সে। তার প্রেম ও গর্ভপাতের বিষয় গুলিতে পরিবারের সকলের শঙ্কিত মনে প্রশ্ন জাগলেও সরসীর কাছে মনে হয়েছে ‘এও চাকরি।’[৪৩] অন্যান্য সাধারণ নিম্ন-মধ্যবিত্ত বোকা মেয়েদের মত সে নিজ জীবনটাকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার জাতাকলে সঁপে দিতে চায়নি। সমাজ-অভিজ্ঞতা জারিত তার একরোখা মনোভাবটাই তাকে অন্যের অনেক আলাদা করে অনন্যা করে তোলে। তাই সরসীই পেরেছে নবীন মুখার্জির কাছ থেকে দশ হাজার টাকার চেক নিজের নামে লিখিয়ে নিতে। ‘জীবনে কাউকে এত খেসারত তিনি দেননি।’[৪৪] তবে উপরে শুষ্ক হলেও সরসীর হৃদয়ের গভীরে সত্যিকারের প্রেমের আবেগ যে একদম করেই ছিল না তা নয়। সুবিমলের নিখাদ ভালোবাসার প্রতি দূর্বলতা বশতই সে ফিরে এসেছে সেই সুবিমলের কাছেই। সুবিমলের প্রতি গভীর আস্থা ও বিশ্বাস

আছে বলেই সেই দশ হাজার টাকার চেকে সুবিমলের নামটাও এনডোর্স করেছে। শেষ পর্যন্ত সে নিখাত প্রেমেরই জয় ঘোষিত হয় গল্পের শেষে তাদের দুজনের মিলনের ইঙ্গিতের মধ্যদিয়ে।

উক্ত গল্পগুলি ছাড়াও **'চাকরি'** গল্পের মাধবী, **'বসন্তপঞ্চম'** গল্পের সুমিতা, **'অপরাহ্ন'** গল্পের জয়ন্তী বোস সহ আরো বহু গল্পে মধ্যবিত্ত চাকুরিরতা নারীদের জীবন সংগ্রামের বহুমাত্রিক জীবন চিত্র নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কলমে মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। বিংশ শতকের চারের দশকে বাঙালি মধ্যবিত্তের রাষ্ট্র জীবন, সমাজ জীবন, পারিবারিক জীবন, পেশাগত অবস্থান, সংস্কার-মূল্যবোধের এক ঘূর্ণাবর্তময় পরিস্থিতির মাঝে স্বাবলম্বিতার পথে পা বাড়ানো চাকুরিরতা নারীদের অবস্থানকে গল্পকার আপন পর্যবেক্ষণ ও সুগভীর অন্তর্দৃষ্টিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। সংকটময় পরিস্থিতিতে নিজের ও নিজের পরিবারের পেট চালানোর লড়াইয়ে পুরুষদের পাশাপাশি বহু মধ্যবিত্ত কুললক্ষ্মী নারীদের সেদিন জীবন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছিল সেদিন। লড়াইটা পরিবারের জন্য হলেও তাদের লড়তে হয়েছিল আপন পরিবার ও সমাজের বিরুদ্ধেও। সেই কঠিন লড়াইয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা মধ্যবিত্ত চাকুরিরতা নারীদের বাস্তব জীবনাখ্যানের সার্থক দ্রষ্টা ও নিপুন শিল্পী হলেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র।

তথ্য সূত্র:

১. মিত্র নরেন্দ্রনাথ, 'সেতার', গল্পমালা ১, প্রথম সংস্করণ- ডিসেম্বর ১৯৮৬, নবম মুদ্রণ- ফেব্রুয়ারী ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ISBN 81-7066-019-x, কলকাতা- ০৯, পৃষ্ঠা. ৪৪।

২. মিত্র নরেন্দ্রনাথ, 'সেতার', গল্পমালা ১, প্রথম সংস্করণ- ডিসেম্বর ১৯৮৬, নবম মুদ্রণ- ফেব্রুয়ারী ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ISBN 81-7066-019-x, কলকাতা- ০৯, পৃষ্ঠা. ৪৪।

৩. মিত্র নরেন্দ্রনাথ, 'সেতার', গল্পমালা ১, প্রথম সংস্করণ- ডিসেম্বর ১৯৮৬, নবম মুদ্রণ- ফেব্রুয়ারী ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ISBN 81-7066-019-x, কলকাতা- ০৯, পৃষ্ঠা. ৪৬।

৪. মিত্র নরেন্দ্রনাথ, 'সেতার', গল্পমালা ১, প্রথম সংস্করণ- ডিসেম্বর ১৯৮৬, নবম মুদ্রণ- ফেব্রুয়ারী ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ISBN 81-7066-019-x, কলকাতা- ০৯, পৃষ্ঠা. ৪৪।

৫. মিত্র নরেন্দ্রনাথ, 'সেতার', গল্পমালা ১, প্রথম সংস্করণ- ডিসেম্বর ১৯৮৬, নবম মুদ্রণ- ফেব্রুয়ারী ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ISBN 81-7066-019-x, কলকাতা- ০৯, পৃষ্ঠা. ৪৯।

৬. মিত্র নরেন্দ্রনাথ, 'সেতার', গল্পমালা ১, প্রথম সংস্করণ- ডিসেম্বর ১৯৮৬, নবম মুদ্রণ- ফেব্রুয়ারী ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ISBN 81-7066-019-x, কলকাতা- ০৯, পৃষ্ঠা. ৪৮।

৭. মিত্র নরেন্দ্রনাথ, 'সেতার', গল্পমালা ১, প্রথম সংস্করণ- ডিসেম্বর ১৯৮৬, নবম মুদ্রণ- ফেব্রুয়ারী ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ISBN 81-7066-019-x, কলকাতা- ০৯, পৃষ্ঠা. ৪৯।

৮. মিত্র নরেন্দ্রনাথ, 'সেতার', গল্পমালা ১, প্রথম সংস্করণ- ডিসেম্বর ১৯৮৬, নবম মুদ্রণ- ফেব্রুয়ারী ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ISBN 81-7066-019-x, কলকাতা- ০৯, পৃষ্ঠা. ৫০।

৯. মিত্র নরেন্দ্রনাথ, 'সেতার', গল্পমালা ১, প্রথম সংস্করণ- ডিসেম্বর ১৯৮৬, নবম মুদ্রণ- ফেব্রুয়ারী ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ISBN 81-7066-019-x, কলকাতা- ০৯, পৃষ্ঠা. ৫০।

১০. মিত্র নরেন্দ্রনাথ, 'সেতার', গল্পমালা ১, প্রথম সংস্করণ- ডিসেম্বর ১৯৮৬, নবম মুদ্রণ- ফেব্রুয়ারী ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ISBN 81-7066-019-x, কলকাতা- ০৯, পৃষ্ঠা. ৫০।

১১. মিত্র নরেন্দ্রনাথ, 'সেতার', গল্পমালা ১, প্রথম সংস্করণ- ডিসেম্বর ১৯৮৬, নবম মুদ্রণ- ফেব্রুয়ারী ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ISBN 81-7066-019-x, কলকাতা- ০৯, পৃষ্ঠা. ৫০।

১২. মিত্র নরেন্দ্রনাথ, 'সেতার', গল্পমালা ১, প্রথম সংস্করণ- ডিসেম্বর ১৯৮৬, নবম মুদ্রণ- ফেব্রুয়ারী ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ISBN 81-7066-019-x, কলকাতা- ০৯, পৃষ্ঠা. ৫০।

১৩. মিত্র নরেন্দ্রনাথ, 'সেতার', গল্পমালা ১, প্রথম সংস্করণ- ডিসেম্বর ১৯৮৬, নবম মুদ্রণ- ফেব্রুয়ারী ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ISBN 81-7066-019-x, কলকাতা- ০৯, পৃষ্ঠা. ৫১।
১৪. মিত্র নরেন্দ্রনাথ, 'সেতার', গল্পমালা ১, প্রথম সংস্করণ- ডিসেম্বর ১৯৮৬, নবম মুদ্রণ- ফেব্রুয়ারী ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ISBN 81-7066-019-x, কলকাতা- ০৯, পৃষ্ঠা. ৫১।
১৫. মিত্র নরেন্দ্রনাথ, 'সেতার', গল্পমালা ১, প্রথম সংস্করণ- ডিসেম্বর ১৯৮৬, নবম মুদ্রণ- ফেব্রুয়ারী ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ISBN 81-7066-019-x, কলকাতা- ০৯, পৃষ্ঠা. ৫১।
১৬. মিত্র নরেন্দ্রনাথ, 'সেতার', গল্পমালা ১, প্রথম সংস্করণ- ডিসেম্বর ১৯৮৬, নবম মুদ্রণ- ফেব্রুয়ারী ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ISBN 81-7066-019-x, কলকাতা- ০৯, পৃষ্ঠা. ৫১।
১৭. মিত্র নরেন্দ্রনাথ, 'সেতার', গল্পমালা ১, প্রথম সংস্করণ- ডিসেম্বর ১৯৮৬, নবম মুদ্রণ- ফেব্রুয়ারী ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ISBN 81-7066-019-x, কলকাতা- ০৯, পৃষ্ঠা.৪৩-৪৪।
১৮. মিত্র নরেন্দ্রনাথ, 'সেতার', গল্পমালা ১, প্রথম সংস্করণ- ডিসেম্বর ১৯৮৬, নবম মুদ্রণ- ফেব্রুয়ারী ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ISBN 81-7066-019-x, কলকাতা- ০৯, পৃষ্ঠা. ৪৫।
১৯. মিত্র নরেন্দ্রনাথ, 'সেতার', গল্পমালা ১, প্রথম সংস্করণ- ডিসেম্বর ১৯৮৬, নবম মুদ্রণ- ফেব্রুয়ারী ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ISBN 81-7066-019-x, কলকাতা- ০৯, পৃষ্ঠা. ৪৩।
২০. মিত্র নরেন্দ্রনাথ, 'সেতার', গল্পমালা ১, প্রথম সংস্করণ- ডিসেম্বর ১৯৮৬, নবম মুদ্রণ- ফেব্রুয়ারী ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ISBN 81-7066-019-x, কলকাতা- ০৯, পৃষ্ঠা. ৪৪।
২১. ঘোষ সুবোধ 'গল্প লেখার গল্প', গল্পমালা ১, প্রথম সংস্করণ- ডিসেম্বর ১৯৮৬, নবম মুদ্রণ- ফেব্রুয়ারী ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ISBN 81-7066-019-x, কলকাতা- ০৯, পৃষ্ঠা. ১০।
২২. মিত্র নরেন্দ্রনাথ, 'অবতরণিকা', গল্পমালা ১, প্রথম সংস্করণ- ডিসেম্বর ১৯৮৬, নবম মুদ্রণ- ফেব্রুয়ারী ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ISBN 81-7066-019-x, কলকাতা- ০৯, পৃষ্ঠা. ১২৪।
২৩. মিত্র নরেন্দ্রনাথ, 'অবতরণিকা', গল্পমালা ১, প্রথম সংস্করণ- ডিসেম্বর ১৯৮৬, নবম মুদ্রণ- ফেব্রুয়ারী ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ISBN 81-7066-019-x, কলকাতা- ০৯, পৃষ্ঠা. ১২৭।
২৪. মিত্র নরেন্দ্রনাথ, 'অবতরণিকা', গল্পমালা ১, প্রথম সংস্করণ- ডিসেম্বর ১৯৮৬, নবম মুদ্রণ- ফেব্রুয়ারী ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ISBN 81-7066-019-x, কলকাতা- ০৯, পৃষ্ঠা. ১২২।
২৫. মিত্র নরেন্দ্রনাথ, 'অবতরণিকা', গল্পমালা ১, প্রথম সংস্করণ- ডিসেম্বর ১৯৮৬, নবম মুদ্রণ- ফেব্রুয়ারী ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ISBN 81-7066-019-x, কলকাতা- ০৯, পৃষ্ঠা. ১২৭।
২৬. মিত্র নরেন্দ্রনাথ, 'অবতরণিকা', গল্পমালা ১, প্রথম সংস্করণ- ডিসেম্বর ১৯৮৬, নবম মুদ্রণ- ফেব্রুয়ারী ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ISBN 81-7066-019-x, কলকাতা- ০৯,পৃষ্ঠা. ১২২।
২৭. মিত্র নরেন্দ্রনাথ, 'অবতরণিকা', গল্পমালা ১, প্রথম সংস্করণ- ডিসেম্বর ১৯৮৬, নবম মুদ্রণ- ফেব্রুয়ারী ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ISBN 81-7066-019-x, কলকাতা- ০৯,পৃষ্ঠা. ১২৩।
২৮. মিত্র নরেন্দ্রনাথ, 'অবতরণিকা', গল্পমালা ১, প্রথম সংস্করণ- ডিসেম্বর ১৯৮৬, নবম মুদ্রণ- ফেব্রুয়ারী ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ISBN 81-7066-019-x, কলকাতা- ০৯,পৃষ্ঠা. ১২৪।
২৯. মিত্র নরেন্দ্রনাথ, 'অবতরণিকা', গল্পমালা ১, প্রথম সংস্করণ- ডিসেম্বর ১৯৮৬, নবম মুদ্রণ- ফেব্রুয়ারী ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ISBN 81-7066-019-x, কলকাতা- ০৯,পৃষ্ঠা. ১২৪।
৩০. মিত্র নরেন্দ্রনাথ, 'অবতরণিকা', গল্পমালা ১, প্রথম সংস্করণ- ডিসেম্বর ১৯৮৬, নবম মুদ্রণ- ফেব্রুয়ারী ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ISBN 81-7066-019-x, কলকাতা- ০৯,পৃষ্ঠা. ১২৫।
৩১. মিত্র নরেন্দ্রনাথ, 'অবতরণিকা', গল্পমালা ১, প্রথম সংস্করণ- ডিসেম্বর ১৯৮৬, নবম মুদ্রণ- ফেব্রুয়ারী ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ISBN 81-7066-019-x, কলকাতা- ০৯, পৃষ্ঠা. ১২৫।

৩২. মিত্র নরেন্দ্রনাথ, 'অবতরণিকা', গল্পমালা ১, প্রথম সংস্করণ- ডিসেম্বর ১৯৮৬, নবম মুদ্রণ- ফেব্রুয়ারী ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ISBN 81-7066-019-x, কলকাতা- ০৯, পৃষ্ঠা. ১৪২।
৩৩. মিত্র নরেন্দ্রনাথ, 'হেডমিস্ট্রেস', গল্পমালা- ৩, প্রথম সংস্করণ- জানুয়ারি ১৯৯২, পঞ্চম মুদ্রণ- জানুয়ারি ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ISBN 81-7215-029-6, কলকাতা- ০৯, পৃষ্ঠা. ১০৪।
৩৪. মিত্র নরেন্দ্রনাথ, 'হেডমিস্ট্রেস', গল্পমালা- ৩, প্রথম সংস্করণ- জানুয়ারি ১৯৯২, পঞ্চম মুদ্রণ- জানুয়ারি ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ISBN 81-7215-029-6, কলকাতা- ০৯, পৃষ্ঠা. ১১০।
৩৫. মিত্র নরেন্দ্রনাথ, 'হেডমিস্ট্রেস', গল্পমালা- ৩, প্রথম সংস্করণ- জানুয়ারি ১৯৯২, পঞ্চম মুদ্রণ- জানুয়ারি ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ISBN 81-7215-029-6, কলকাতা- ০৯, পৃষ্ঠা. ১১০।
৩৬. মিত্র নরেন্দ্রনাথ, 'হেডমিস্ট্রেস', গল্পমালা- ৩, প্রথম সংস্করণ- জানুয়ারি ১৯৯২, পঞ্চম মুদ্রণ- জানুয়ারি ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ISBN 81-7215-029-6, কলকাতা- ০৯, পৃষ্ঠা. ১০৯।
৩৭. মিত্র নরেন্দ্রনাথ, 'হেডমিস্ট্রেস', গল্পমালা- ৩, প্রথম সংস্করণ- জানুয়ারি ১৯৯২, পঞ্চম মুদ্রণ- জানুয়ারি ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ISBN 81-7215-029-6, কলকাতা- ০৯, পৃষ্ঠা. ১১৫-১১৬।
৩৮. মিত্র নরেন্দ্রনাথ, 'চেক', গল্পমালা ১, প্রথম সংস্করণ- ডিসেম্বর ১৯৮৬, নবম মুদ্রণ- ফেব্রুয়ারী ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ISBN 81-7066-019-x, কলকাতা- ০৯,পৃষ্ঠা. ৯৫।
৩৯. মিত্র নরেন্দ্রনাথ, 'চেক', গল্পমালা ১, প্রথম সংস্করণ- ডিসেম্বর ১৯৮৬, নবম মুদ্রণ- ফেব্রুয়ারী ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ISBN 81-7066-019-x, কলকাতা- ০৯,পৃষ্ঠা. ৯৬।
৪০. মিত্র নরেন্দ্রনাথ, 'চেক', গল্পমালা ১, প্রথম সংস্করণ- ডিসেম্বর ১৯৮৬, নবম মুদ্রণ- ফেব্রুয়ারী ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ISBN 81-7066-019-x, কলকাতা- ০৯,পৃষ্ঠা. ৯৬।
৪১. মিত্র নরেন্দ্রনাথ, 'চেক', গল্পমালা ১, প্রথম সংস্করণ- ডিসেম্বর ১৯৮৬, নবম মুদ্রণ- ফেব্রুয়ারী ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ISBN 81-7066-019-x, কলকাতা- ০৯,পৃষ্ঠা. ৯৪।
৪২. মিত্র নরেন্দ্রনাথ, 'চেক', গল্পমালা ১, প্রথম সংস্করণ- ডিসেম্বর ১৯৮৬, নবম মুদ্রণ- ফেব্রুয়ারী ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ISBN 81-7066-019-x, কলকাতা- ০৯,পৃষ্ঠা. ১০৬।
৪৩. মিত্র নরেন্দ্রনাথ, 'চেক', গল্পমালা ১, প্রথম সংস্করণ- ডিসেম্বর ১৯৮৬, নবম মুদ্রণ- ফেব্রুয়ারী ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ISBN 81-7066-019-x, কলকাতা- ০৯,পৃষ্ঠা. ১০৭।
৪৪. মিত্র নরেন্দ্রনাথ, 'চেক', গল্পমালা ১, প্রথম সংস্করণ- ডিসেম্বর ১৯৮৬, নবম মুদ্রণ- ফেব্রুয়ারী ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ISBN 81-7066-019-x, কলকাতা- ০৯, পৃষ্ঠা. ১০৭।